জীবনের বাস্তবতা

মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান

জীবনের বাস্তবতা

(দ্য রিয়ালিটি অফ লাইফ)

মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান

GOODWORD BOOKS

প্রথম প্রকাশিত ঃ ২০২৩

অনুবাদক এবং সম্পাদকমণ্ডলী:

মাহমুদ হোসেন (অনুবাদক)
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
মুস্তাফা কামাল হায়দার
সুবেদার মেজর মহিউদ্দিন মণ্ডল

Goodword Books
A-21, Sector 4, NOIDA-201301
Delhi NCR, India
Tel. +9111-41827083, Mob: +91-8588822678
email: info@goodwordbooks.com
www.goodwordbooks.com

Center for Peace and Spirituality
1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013
Mob. +91-9999944119
email: info@cpsglobal.org
www.cpsglobal.org

Peace and Spirituality Forum
(Bengal Chapter of CPS International)
mwkbangla@gmail.com

Printed in India

স্রষ্টার সৃজন-পরিকল্পনা

পাশ্চাত্যের এক দার্শনিক লিখেছিলেন যে, মনে হয় এই মহাবিশ্বে মানুষ যেন এক আগন্তুক। এটা প্রতীয়মান হয়, মানুষকে যেন পৃথিবীর জন্য তৈরী করা হয় নি, এবং পৃথিবীকেও যেন মানুষের জন্য তৈরী করা হয় নি। উভয়ের মধ্যেই অসামঞ্জস্য প্রকট।

মানুষ অসীম সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও, বর্তমান বিশ্বে সেই অসীম সম্ভাবনার খুব অল্প পরিমাণই ব্যবহারের সুযোগ পায়। তার স্বভাবানুযায়ী, মানুষ অনেক দিন বেঁচে থাকতে চায়, কিন্তু অচিরেই তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মৃত্যু আসে এবং তার জীবনের অবসান ঘটায়। তার হৃদয় সমুদ্রে তার ইচ্ছেরা নোঙর ফেলে, কিন্তু সেই ইচ্ছেগুলি কখনোই পূর্ণতা পায় না। সে মনে মনে স্বপ্নের ঘর তৈরি করে, কিন্তু সেগুলি বাস্তবায়িত হয় না। এক্ষেত্রে ধনী এবং গরিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কেন মানুষ এবং বর্তমান বিশ্বের মধ্যে এতটা অসামঞ্জস্য? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, যদি আমরা স্রষ্টার সৃজন পরিকল্পনা বুঝতে পারি।

আসল সত্যিটা হল এই যে, স্রষ্টা - মানুষের সৃষ্টিকর্তা,

মানুষকে তৈরি করেছেন তাঁর পরিকল্পনানুযায়ী। স্রষ্টার পরিকল্পনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে মানুষের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া থাকাটা খুবই জরুরি—ব্যাপারটা ঠিক এইরকম যে, একটি যন্ত্রের কার্যকারিতা আমরা তখনই বুঝতে পারব যখন আমরা সেই নির্মাতার নকশাটা বুঝতে পারব যিনি যন্ত্রটি বানিয়েছেন। নির্মাতার ভাবনা বোঝা ছাড়া আর অন্য কোনো কিছুই বিষয়টাকে পরিষ্কার করতে পারবে না যে যন্ত্রটি কী কারণে তৈরি হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

মানুষের অস্তিত্বটা এমন এক অনন্য ব্যাপার যে এর মতো দ্বিতীয় উদাহরণ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও পাওয়া যাবে না। মানুষকে যথার্থই 'শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি' বলা হয়, যার অর্থ হল, সৃষ্ট সমস্ত বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাৎপর্যপূর্ণ 'সত্তা'। এমন ধরনের 'তাৎপর্যপূর্ণ সত্তা' কখনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করা হয় না। মানুষের সৃষ্টিকর্তা তাকে সৃষ্টি করেছেন (একটি বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী)। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী মানুষ এই বর্তমান, অসম্পূর্ণ পৃথিবীতে একটি পর্যায়কাল অতিবাহিত করবে এবং পরবর্তীকালে মানুষ তার ক্রিয়াকর্মের ওপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ এবং চিরস্থায়ী জগতে বসবাসের অধিকার অর্জন করবে, যার আর এক নাম হল স্বর্গ বা বেহেশত।

জগতের সৃষ্টিকর্তা এই জগত সংসারকে রচনা করেছেন দু'ভাগে; একটি অংশ হল এই বর্তমান বিশ্ব যেখানে আমরা আমাদের জন্মের পর নিজেদের জীবন কাটাই এবং অপর অংশটি হল ওই চিরস্থায়ী জগত যেখানে আমরা মৃত্যুর পর নিজেদের জীবন কাটাই। সৃষ্টিকর্তা আসলে মানুষের জীবনকে শাশ্বতরূপে সৃষ্টি করে তা দুটো স্তরে ভাগ করেছেন— একটি মৃত্যু-পূর্ববর্তী বা ইহলৌকিক জীবনকাল এবং আর একটি মৃত্যু-পরবর্তী বা পারলৌকিক জীবনকাল। মৃত্যু-পূর্ববর্তী সীমিত সময়ের জীবনটি হল মানুষের একটি পরীক্ষা যার ফল হিসেবে সে পুরস্কার পাবে নাকি শাস্তি পাবে, তা ঠিক হবে মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে। এই চিরন্তন জগতের অস্তিত্ব রক্ষার্থে এটাই হল সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনা। সৃষ্টিকর্তার এই সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য হল এই যে, স্বর্গের স্থায়ী বসবাসকারী কে হবে তা বেছে নেওয়া।

স্বর্গ (বেহেশত) কী?

স্বর্গ বা বেহেশত হল সেই আদর্শ স্থান যা লাভ করা প্রতিটি নরনারীর হৃদয়ের লালিত বাসনা। স্বর্গই এমন

একটি স্থান যেখানে মানুষের অমিত ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে। প্রতিটি মানুষ নিজ সত্তার সমস্ত কণা দিয়ে এরকমই একটি স্বর্গের প্রত্যাশা করে এবং উপযুক্ত মানুষদের অভ্যর্থনা জানাতেও স্বর্গের যাবতীয় উপকরণ অপেক্ষা করে রয়েছে।

স্বর্গ হল সেই স্থান যেখানে মানুষ সম্পূর্ণ পূর্ণতা পাবে। সেখানে সে যেমন করে ভাবতে চায় তেমন করেই ভাবতে পারবে, যা দেখতে চায় তা দেখতে পাবে, যা শুনতে তার ভালো লাগবে তা-ই সে শুনবে, যা তাকে সর্বোচ্চ আনন্দ দেবে তা-ই সে নাগালের মধ্যে পাবে। সেখানে সে এমন সব মানুষের সাহচর্য পাবে যারা তার জীবনকে সর্বতোভাবে অর্থবহ করে তুলবে, যেখানে মৃদুমন্দ বাতাস জীবনকে দেবে অপার স্বস্তি, যেখানে তার কাঙ্ক্ষিত খাবার নিমেষেই চলে আসবে নাগালের মধ্যে, আর সেখানে সে এমন পানীয় পান করবে যা ছিল কেবল তার একসময়ের কল্পনার অংশ।

কীভাবে আমরা স্বর্গে যাবার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারি?

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে কোনো পুরুষ কিংবা নারীকে স্বর্গে যাবার উপযুক্ত হতে হলে তাকে দুটো বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে: প্রথমত, সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া, এবং দ্বিতীয়ত নীতিনিষ্ঠ জীবনযাপন করা। যারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, স্বর্গ হবে তাদেরই আবাসস্থল যেখানে তাদের মনের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হবে। আর যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না, তাদের জন্য থাকবে অনন্তকাল ধরে বঞ্চনা।

এই ইহলৌকিক জীবনে প্রতিটি মানুষই স্বাধীন। তার এই স্বাধীনতা কিন্তু কোনো অধিকারবোধ বোঝায় না, বরং এটা তার জন্য একটা পরীক্ষার অংশ। মানুষকে যা করতে হবে তা হল, তাকে একক ঈশ্বরের সত্যতাকে মেনে নিয়ে তাঁর (ঈশ্বরের) কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে হবে। তবে এই আত্মসমর্পণের ব্যাপারটি হতে হবে তার নিজের ইচ্ছায়, কোনো বাধ্যবাধকতা থেকে নয়। একক ঈশ্বরের সত্যতার কাছে আত্মসমর্পণ করাটা মানুষের জন্য একটি বড় ধরনের ত্যাগেরও ব্যাপার বটে। এই (একক ঈশ্বরের) সত্যতাকে স্বীকার করার

মাধ্যমে সে কেবল ঈশ্বরের সামনেই নয়, অন্য মানুষের সামনেও নিজের ক্ষুদ্রতাকে প্রকাশ করে। কিন্তু এটা তার জন্য খুবই পুণ্যের যা তাকে উচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন করবে, তাকে নিয়ে যাবে স্বর্গের দোরগোড়ায়। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা হল, নীতিনিষ্ঠ জীবনযাপন করা। সাধারণত মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গঠিত হয় বিভিন্ন রকমের আবেগ-অনুভূতির সমন্বয়ে; যেমন, রাগ, হিংসা, প্রতিশোধস্পৃহা, ঘৃণা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি। এইসব নেতিবাচক অনুভূতিগুলি মানুষের ব্যক্তিত্বকে আকার প্রদান করে। কিন্তু কিছু বিষয়ের দিক থেকে মানুষের জীবনযাত্রা হতে হবে সুশৃঙ্খল। পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার নিজ চরিত্র গঠন করা উচিত নয়, বরং তাকে নিজেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে; উচ্চতর নীতিবোধের ওপর ভিত্তি করে তার নিজ চরিত্র স্থাপন করা উচিত। আর তখন এই ইহলোকেই তাকে বলা যাবে ‘স্বর্গীয় চরিত্রসম্পন্ন’ একজন মানব।

সৃজন-পরিকল্পনার সঠিক দিশা

সৃষ্টিকর্তার সৃজন-পরিকল্পনা অনুযায়ী মানুষকে তার জীবনকালে পরীক্ষার অংশ হিসেবে বিভিন্ন সমস্যার

মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সংগ্রাম এবং দুঃখ-কষ্ট সৃষ্টিকর্তার সৃজন-পরিকল্পনারই অখণ্ড অংশ। জীবনের এই পরীক্ষা এবং দুর্দশার মোকাবিলা না করা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। আর এসবই প্রতি মুহূর্তে মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে, এই পৃথিবী আরাম-আয়েশ ও আমোদ-প্রমোদে মেতে থাকার কোনো স্থান নয়, বরং এখানে প্রতিনিয়ত কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার মধ্য দিয়ে পারলৌকিক জীবনে স্বর্গ লাভ করার জন্য নিজেকে উপযোগী করে তোলাই হওয়া উচিত মানবজীবনের মূল লক্ষ্য।

বর্তমান বিশ্ব একদিকে যেমন দ্রুত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরাজ করছে চরম প্রতিকূলতা। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার সৃজন-পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার ফলে অনেক লোকই এই প্রতিকূল অবস্থার কারণটি ঠিকমতো বুঝতে পারে না। ফলে তারা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাঁর তৈরি করা পরীক্ষাগুলিতে অকৃতকার্য হিসেবে বিবেচিত হয়। মানুষের জীবনে মানসিক চাপ একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। আর সেইসঙ্গে এই চাপ কমানোর জন্য তৈরি হয়েছে বিভিন্ন রকমের

নিরাময়কেন্দ্র। আসলে এই কেন্দ্রগুলি যা করে তা হল, মানসিক চাপ কমাতে গিয়ে এই কেন্দ্রগুলো মানুষকে তার চিন্তাশক্তি ব্যবহার না করার পরামর্শ দেয়, যা তাকে সাময়িকভাবে অসাড় করে ফেলে। এভাবে আসলে মানসিক সমস্যার সমাধান হয় না। এ ক্ষেত্রে একটি মাত্র সঠিক পথ আছে আর সেটি হল, মানসিক চাপকে এড়িয়ে না গিয়ে বাস্তবতার নিরিখে তা সামলানো। চিন্তাগুলি একেবারে ঝেড়ে ফেলা বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখানোর পরিবর্তে আমরা এভাবেই মানসিক চিন্তাগুলিকে পরিচালনা করব এবং এভাবেই আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারব। পৃথিবীতে মানুষের জন্য অপ্রীতিকর অবস্থা বিরাজমান আছে যাতে সে তা থেকে শিক্ষা নেয়। এই অপ্রীতিকর অবস্থার অভিজ্ঞতাই সত্যিকারের শিক্ষা দেবে যা পারলৌকিক জীবনে স্বর্গেও স্মরণ করাবে।

সমস্যা হল, যেসব মানুষ অতটা প্রজ্ঞাবান নয়, যারা সৃষ্টিকর্তার সৃজন-পরিকল্পনা দেখতে পারে না, তারা মৃত্যুর আগে এই পৃথিবীতেই তাদের স্বর্গ বানাতে চায়। কিন্তু সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়মে তা তো একপ্রকার অসম্ভব! আসলে পৃথিবীতে স্বর্গ বানানোর এই আকাঙ্ক্ষাই মানবজীবনের সব সমস্যার মূল। সৃষ্টিকর্তার সৃজন-

পরিকল্পনানুযায়ী, মৃত্যুর আগে ইহজগতে মানুষকে তার সীমাবদ্ধতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সৃষ্টির নিয়মকে মেনে নিয়ে তদনুযায়ী জীবনকে সাজানোই হবে মানুষের জন্য সঠিক কাজ। সৃষ্টিকর্তার সৃজন-পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে নিয়ে সেই অনুযায়ী নিজের জীবন সাজানোই মানুষের একমাত্র কাজ হওয়া উচিত। এই পৃথিবীতে তার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত ঈশ্বরের চোখে নিজেকে উপযুক্ত করে তোলার মধ্য দিয়ে মৃত্যুর পরে স্বর্গ বা বেহেশত লাভ নিশ্চিত করা। সেই ব্যক্তিই সফল যে এই নশ্বর পৃথিবীর সাময়িক বাসস্থানে বাস করার সময় পরের চিরস্থায়ী জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পাথেয় নিশ্চিত করে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

একদল মানুষকে যদি প্রশ্ন করা যায়, “মানবজাতির জন্য সর্বাধিক জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কী?” তাহলে একেকজনের কাছ থেকে একেক রকম উত্তর পাওয়া যাবে। কেউ বলবে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসারই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেউ বলবে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, আবার কেউ বা বলবে সম্পদের উৎপাদন ও সুষম বন্টনই হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মতের এতটা ভিন্নতা

প্রমাণ করে যে মানুষ সাধারণভাবে নিজেদেরই ভালো করে চেনে না। যদি চিনত তাহলে সবাই এ বিষয়ে একমত হতো যে, মানুষের অস্তিত্বের বাস্তবতাকে উপেক্ষা করাই আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তাকে যে একদিন মরতে হবে এবং তার স্রষ্টার কাছে কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে, এই ব্যাপারটি জেনেবুঝেও মানুষ ক্রমাগতভাবে অগ্রাহ্য করে যাচ্ছে। অস্তিত্বের বাস্তবতার ব্যাপারে সচেতন হলে তো সে ইহলোকের চেয়ে পরলোকের ওপরই বেশি মনোযোগ দিত, মৃত্যুপরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের ব্যাপারটি সর্বক্ষণ তার মাথার ভেতরে ঘুরপাক খেত। আপনি যদি কোনো একটি ব্যস্ত রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অনবরত যানচলাচল এবং পথচারীদের নিদারুণ ব্যস্ততা লক্ষ্য করেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন আজকের পৃথিবীতে মানুষ কোন বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। একবার ভাবুন তো, রাস্তায় কেন অবিরাম যানবাহন আর এত মানুষের চলাচল? ব্যবসায়ীরা কেন তাদের দোকানগুলো সাজিয়ে রেখেছে? কোথা থেকে এত মানুষ আসছে; আর কোথায়ই বা তারা যাছে? তারা কী বিষয় নিয়ে কথা বলছে; আর তাদের একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাত করার সত্যিকারের

কারণই বা কী? কোন বিষয়ে তাদের আগ্রহ সবচেয়ে বেশি? তারা বাড়ি থেকে কোন জিনিস নিয়ে বের হয়; আর কী নিয়েই বা বাড়ি ফিরতে চায়? আপনি যদি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন, মানুষ তার জীবনের ভিত হিসেবে কী বেছে নিয়েছে, আর কী পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আজকের দিনে মানুষ কেবল তার নিজের আকাঙ্ক্ষা মেটানোর কাজেই ব্যস্ত। পরকালের জীবনের কথা ভুলে গিয়ে ইহকালের এই নশ্বর জীবনেই সে সবকিছু পেতে চায়। তার সব সুখই যেন নিহিত রয়েছে পার্থিব জীবনের লক্ষ্যপ্রাপ্তির ওপর! লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলেই সে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে। নিত্যদিন আনন্দ উপভোগ করার মধ্যেই সে খুঁজে পায় সফলতার উপাদান। অন্যদিকে এসব থেকে বঞ্চিত হওয়াটাই যেন তার কাছে চরম এক ব্যর্থতা! মানুষ কেবল এই সাময়িক মোহের পেছনেই ছুটছে। আগামীকালের কথা কেউ আর ভাবছে না। প্রত্যেকেই তার ভাগে অংশটুকু আজকেই, এমনকি এই মুহূর্তেই, পেতে চায়।

এমন অবস্থা কেবল যে শহরের মানুষদের বেলায় প্রযোজ্য তা নয়, গ্রামগঞ্জের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের চিত্রটাও অনেকটা

একই রকমের। প্রাপ্তির নেশাটা সর্বত্রই একই। পুরুষ কিংবা নারী, ধনী কিংবা গরিব, যুবক কিংবা বৃদ্ধ, শহুরে কিংবা গ্রামীণ, ধার্মিক কিংবা অধার্মিক সবাই অবিরাম একই মোহের পেছনে ছুটছে। পার্থিব প্রাপ্তির লক্ষ্যে মানুষ তার ধর্মবিশ্বাস আর বিবেককেও বিসর্জন দিচ্ছে। অথচ সামগ্রিক বিচারে এসব থেকে মানুষ যা পায় তা নিতান্তই মূল্যহীন, গুরুত্বহীন। জাগতিক এই সফলতা মৃত্যুর পরে তার আর কোনোই কাজে আসবে না। এদের অবস্থা সেই যুবকের মতো যে তার বৃদ্ধ বয়সের জন্য কোনো সঞ্চয়ই করল না! একসময় বার্ধক্যে উপনীত হলে সে দেখল যে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর সচল নেই, সে আর আগের মতো কাজ করতে পারছে না। তখন তার আর কিছুই করার থাকে না। আমরা সবাই আমাদের বর্তমান নিয়েই চিন্তিত। চোখের সামনে প্রতিনিয়ত মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে দেখেও আমাদের কোনো বোধোদয় হয় না। অথচ হঠাৎ যদি যুদ্ধের সাইরেন বেজে ওঠে এবং বোমা পড়ার আশঙ্কা দেখা যায়, মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে উঠে, মুহূর্তেই রাস্তাঘাট খালি হয়ে যায়। সাইরেন শোনার পরও কেউ যদি নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার জন্য তৎপর না হয়, তাহলে তার মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

সৃষ্টিকর্তা আমাদের আরেকটি ভয়াবহ বিপদের ব্যাপারে আগে থেকেই সাবধান করেছেন যা নিয়ে আমরা তেমন একটা ভাবি না। কী সেই সাবধানবাণী? তিনি তাঁর পাঠানো নবিদের মাধ্যমে মানবজাতিকে বলেছেন, "আমার উপাসনা করো, একে অন্যের প্রতি দায়িত্ব পালন করো এবং আমার ইচ্ছানুরূপ জীবন যাপন করো। যারা তা করবে না, তাদের যে কী শাস্তি দেওয়া হবে তা কল্পনারও অতীত।" যদিও সৃষ্টিকর্তার এই ঘোষণা সবার কাছে পৌঁছে গেছে এবং সবাই তা স্বীকারও করে নিয়েছে, তবুও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি; যেন কোনো কিছুই হবে না। পার্থিব প্রাপ্তিযোগের নেশায় মানুষ সব ধরণের অপকর্মই করে চলেছে।

কিন্তু পরের জীবনকে সফল করার জন্য যথাযথ কাজ করার ব্যাপারে মানুষের তেমন ভ্রূক্ষেপ নেই। এভাবেই জীবনের রেলগাড়ি অনবহিতভাবে চলতে চলতে এমন স্থানে গিয়ে পৌঁছায় যেখান থেকে ফিরে আসা আর সম্ভব হয় না। মিলিটারির কার্যালয় থেকে আসা সাইরেনের শব্দে মানুষ যতটা তৎপর হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টার কাছ থেকে আসা বিপদবার্তায় তা হয় না। স্রষ্টার বার্তায় সাড়া

দেওয়া তো দূরের কথা, সে তার চলার গতি সামান্যতমও পরিবর্তন করে না।

এরকম দুঃখজনক অবস্থার কারণ কী হতে পারে? কারণ হল, মিলিটারি কার্যালয় থেকে যে সাইরেনের শব্দ আসে তা আমরা নিজ কানে শুনতে পাই, শীঘ্রই কী ঘটতে যাচ্ছে তা আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি। অন্যদিকে সৃষ্টিকর্তার সাবধানবাণী না মানার ফল আমরা এই জীবনে দেখতে পাই না, মৃত্যুর দেওয়াল আমাদের তা দেখতে দেয় না। অতএব মিলিটারি সাইরেনের শব্দ সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেও সৃষ্টিকর্তা যে বিপর্যয়ের কথা বলে আমাদের সাবধান করেছেন, তা তাদের তেমন একটা নাড়া দেয় না। বিচারের দিন যে সত্যিই আসছে তা তাদের হৃদয়ে তেমন একটা আলোড়ন তোলে না। তাই তারা পাপাচার থেকেও যেমন সরে আসতে পারে না, তেমনি ন্যায়নিষ্ঠ জীবনযাপনের পথেও চলার জন্য এগিয়ে আসতে পারে না।

বাইরের বিশ্বকে দেখার জন্য সৃষ্টিকর্তা যে আমাদের কেবল দুটো চোখ দিয়েছেন তা-ই নয়, ‘তৃতীয়’ আরেকটি চোখও দিয়েছেন যা আমাদের ধারণার বাইরের অদৃশ্য বাস্তবতাকে বুঝতে সাহায্য করে। এই তৃতীয় চোখটি

আসলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির চোখ। যেসব লোক বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার করে না, তারা একপ্রকার দ্বিধায় থাকে। তারা দুই চোখে যা দেখছে, তা-ই তাদের কাছে বাস্তবতা। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই তারা নিশ্চিত হতে পারত, তারা যা দেখতে পাচ্ছে তা সঠিক কি না।

তবে একটি অবধারিত ব্যাপার সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন; আর তা হল 'মৃত্যু'। একথা প্রত্যেকেই জানে, মৃত্যু এসে যে কোনো সময় তাকে গ্রাস করতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর কথা মনে এলেই মানুষের মনে প্রথমে বৈষয়িক সব চিন্তাভাবনা চলে আসে; যেমন, "মৃত্যুর পরে আমার সন্তানদের কী হবে?" বাস্তবিক সন্তানদের ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে গিয়ে তাদের জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় পার হয়ে যায়। অথচ তারা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য তেমন কোনো চেষ্টাই করে না। তাদের আচার-আচরণ দেখে মনে হয়, সন্তানরাই কেবল বেঁচে থাকবে আর তারা অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে; তাই নিজেদের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার কিছু নেই। মৃত্যুর পরে যে একটা জীবন আছে সে ব্যাপারে তারা একদমই উদাসীন। কিন্তু মৃত্যুর পরেই তো আসল জীবনের শুরু। লোকেরা যদি জানত, কবর দেওয়ার পরপরই তারা আরেকটি জীবনে

প্রবেশ করতে যাচ্ছে, তাহলে তারা তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের বদলে নিজেদের নিয়েই বেশি চিন্তিত থাকত। সব মানুষই আস্তিক কিংবা অজ্ঞেয়বাদী— মৃত্যু পরবর্তী জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান। এই সন্দেহের পেছনে মূলত দুটো কারণ কাজ করে। প্রথমত, মৃত্যুর পরে মানুষের দেহ যেখানে ধুলোয় মিশে যায়, কোনো চিহ্নই আর থাকে না, সেক্ষেত্রে কীভাবে তা পুনরুজ্জীবিত করা হবে? দ্বিতীয়ত, বর্তমান জীবন আমাদের সামনে দৃশ্যমান হলেও মৃত্যুর পরের জীবন তা নয়। যেখানে কেউ তা (মৃত্যুপরবর্তী জীবনকে) দেখেনি, সেখানে কীভাবে একে বিশ্বাস করা যায়?

এই দুটো বিষয় নিয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করব।

মরণোত্তর জীবন

যেসব লোকের মরণোত্তর জীবন নিয়ে অতটা মাথাব্যথা নেই তারা ভাবে, "যদি আমি মরে যাই, তাহলে কি আমি আবার নতুন জীবন পাব?" আসলে মরণোত্তর জীবনের অস্তিত্ব নিয়ে তাদের মনের গভীরে থাকা সন্দেহই এই প্রশ্নকে জন্ম দেয়। এটা অবশ্যই তার অস্তিত্বের প্রতি

সচেতন অথবা অবচেতন মনের সন্দেহ হতে পারে। কিন্তু মরণোত্তর জীবনের বাস্তবতা নিয়ে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, সৃষ্টিকর্তা আমাদের কাছে এ ব্যাপারে কিছুই গোপন রাখেননি। আমাদের ভাবনা-চিন্তার জন্য তিনি পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে রেখেছেন। এটাই আমাদের ঈশ্বরের এবং আমাদের চারিদিকে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনার বিষয়ে সত্যিকারের অনুভব করায়। এই মহাবিশ্ব আসলে একটা আয়না যার দিকে ঠিকমতো তাকালেই আমরা পরজগতের প্রতিবিম্ব দেখতে পাব। আসুন, ব্যাপারটা আরেকটু বোঝার চেষ্টা করি।

আমাদের সবারই জানা আছে যে, মানুষ সবসময় একই অবয়বে থাকে না। একটা নিরাকার পদার্থ থেকে উদ্ভূত হয়ে সে মাতৃজঠরে ক্রমশ বেড়ে উঠতে থাকে। তারপর একসময় সে একজন পূর্ণাবয়বের মানুষ হিসেবে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়। খালি চোখে দেখা যায় না এমন একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জড় পদার্থ থেকে একটা ছয়ফুট দীর্ঘ মানুষে পরিণত হওয়া তো অহরহ ঘটনা। তাহলে মানবদেহ ধূলিকণা হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও তা থেকে আবার একটি পরিপূর্ণ মানুষের রূপ

কেন গ্রহণ করতে পারবে না? আর এই ব্যাপারটা বুঝতে আমাদের কেনই বা এতটা অসুবিধা হবে? আমাদের চারপাশের সব মানুষ পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। প্রকৃতির নিয়মেই ওই পরমাণুগুলো একত্রিত হয়ে আবেগ-অনুভূতিসম্পন্ন মানুষে পরিণত হয়, যারা চলতে-ফিরতে এবং একই সঙ্গে ভাবনা-চিন্তা করতেও সক্ষম। মৃত্যুর পরও জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমাদের দেহাবশেষও সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে ঠিক একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আবারও মানুষের রূপ গ্রহণ করবে। আগে যেভাবে ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি ঘটলে সেখানে অসাধারণত্ব কোথায়?

জগতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও জীবনের পুনরাবৃত্তির বিষয়টা লক্ষ্য করা যায়। প্রতি বছরই গাছপালা বড় হয় এবং বর্ষাকালে সবুজের সমারোহ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর একসময় ধরণী শুকিয়ে যায়, ফুলে-ফলে শোভিত স্থান পরিণত হয় মরুভূমিতে। এভাবেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। আবার যখন বর্ষাকাল সমাগত হলে আকাশ থেকে বৃষ্টির ধারা নেমে আসে, তখন ওই একই গাছপালা আবার জীবন ফিরে পায়, একই মরুভূমি

পরিণত হয় তৃণভূমিতে। একই পন্থায় মানুষও একসময় তার মৃত্যুর পরে জীবন ফিরে পাবে। বর্তমানকে ঘিরে আমাদের কল্পনাশক্তি আবর্তিত হয় বলেই মরণোত্তর জীবন নিয়ে আমাদের এত সন্দেহ। আমরা ভাবি, আমাদের চারপাশের মানুষগুলো মরে পচে মাটির সাথে মিশে যাবার পর আবার কীভাবে তারা নতুন রূপ নিয়ে পুনরুত্থিত হবে? আমরা তো আশেপাশে তাকালেই দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাই, মৃত্যুর পরে মানুষের দেহ কীভাবে নিথর হয়ে পড়ে, তার শরীরের সমস্ত ক্রিয়াদি কীভাবে বন্ধ হয়ে যায়! তারপর ব্যক্তিগত ধর্মাচরণ কিংবা সামাজিক প্রথার ওপর ভিত্তি করে মৃতদেহকে কবর দেওয়া অথবা দাহ করা হয়। কিছুদিনের মধ্যে ওই মৃতদেহ ছোট ছোট কণার আকারে মাটির সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে সাধারণ দৃষ্টিতে তা আর চেনা যায় না। নিত্যদিন এরকমভাবে মানুষের অন্তর্ধান দেখার কারণে আমরা বুঝতে পারি না যে, সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া একজন মানুষ আবার কীভাবে পুনরুজ্জীবিত হবে!

আসলে 'মানুষ' বলতে কোনো ব্যক্তির দৈহিক অবয়বকে না বুঝে দেহের সঙ্গে থাকা 'আত্মা'-কে বুঝতে হবে। আমরা জানি, আমাদের দেহ ছোট ছোট কোষ দিয়ে

গঠিত। দেহের এই কোষগুলো অনেকটা ইমারতের ইটের মতো। আমাদের দৈহিক কাঠামোর ইটগুলো জীবনের নিয়মেই প্রতিনিয়ত ধ্বংস হচ্ছে। দেহের এই ক্ষতি আবার আমরা নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ করার মাধ্যমে পূরণ করে চলেছি। খাবার হজম হয়ে তা থেকে বিভিন্ন রকমের কোষের সৃষ্টি হয় যা শারীরিক অবক্ষয়কে পূরণ করে। অন্য কথায়, নতুন কোষ পুরানো কোষকে প্রতিস্থাপিত করে। এভাবেই মানবদেহ ক্রমাগতভাবে ক্ষয় হতে হতে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই প্রক্রিয়া চলতে চলতে একসময় আমাদের পুরো দেহটাই প্রতিস্থাপিত হয়ে যায়। গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায়, সাধারণত দশ বছরের মধ্যেই মানবদেহের সবগুলো কোষ ক্ষয় হয়ে গিয়ে আবার নতুন করে সৃষ্টি হয়। অন্যভাবে বললে, আমাদের শরীরে দশ বছর আগে যা ছিল তার কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না; শরীরের পুরো গঠনটাই সম্পূর্ণ নতুন।

কল্পনা করুন, আপনার শরীর থেকে বিগত দশ বছরে বিচ্ছিন্ন হওয়া কোষগুলোকে একত্রিত করা হল। সেক্ষেত্রে ওই কোষগুলো দিয়ে ঠিক আপনার মতোই দেখতে আরেকজন মানবকে গঠন করা সম্ভব হবে। আপনার

আয়ু যদি একশ বছর হয় তাহলে আপনার মতো এরকম দশজনকে গঠন করা সম্ভব। কিন্তু ওই দশজন অবয়বে আপনার মতো দেখতে হলেও তারা আসলে নির্জীব মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়; কারণ তাদের মধ্যে 'আপনি' (আপনার আত্মা) নেই। ধরুন, আপনি দশ বছর আগে কারও সঙ্গে একটি চুক্তি করেছেন। আপনি যে হাত দিয়ে সেই চুক্তিপত্রে সাক্ষর করেছিলেন, অথবা যে কণ্ঠ দিয়ে তখন সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তা কিন্তু আর আগের মতো আপনার দেহের অংশ হিসেবে নেই! অথচ 'আপনি' ঠিকই পৃথিবীতে আছেন, দশ বছর আগে সাক্ষর করা চুক্তিকে 'আপনি' অস্বীকার করছেন না, এবং চুক্তির বিধিবিধান মেনে চলার ব্যাপারেও আপনি বদ্ধপরিকর। অর্থাৎ আপনার অন্তর্নিহিত মানবসত্তা একই রয়েছে, দেহগত রূপান্তরের সঙ্গে তা একটুও পালটায়নি। এ থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, আমাদের দেহের পরিবর্তন কিংবা রূপান্তর ঘটলেও আত্মা চিরস্থায়ী। আর 'হোমো সেপিয়েন্স' বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি, তা হল এক ধরনের শারীরিক অবয়ব, যা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যায়, একটা ভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়, যা অক্ষত থাকে দেহ বিনষ্ট হলেও। আসল সত্য হল দেহ পালটে যায় কিন্তু আত্মার কোনো অবলুপ্তি ঘটে না।

কিছু মানুষ ভুলক্রমে মনে করে যে, 'জীবন' হল বহুমুখী কণার 'সমাহার' এবং 'মৃত্যু' হল পরবর্তীতে সেই কণাগুলোর 'বিক্ষেপণ'। একজন উর্দু ভাষার কবি চকবাস্ত, ব্যাপারটা এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

'জিন্দেগি কেয়া হ্যায়, আনাসির ম্যাঁ জহুর-এ-তরতীব

মউত কেয়া হ্যায়, ইনহি আজজা কা পরেশান হোনা।'

(জীবন কী? সে-তো বিভিন্ন উপাদানকে সুবিন্যস্ত রাখা। এবং মৃত্যু কী? সেই উপাদানগুলোর বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়া।)

কিন্তু উপরের কথাটা আসল সত্যকে প্রকাশ করে না। জীবন যদি কেবলই 'মৌলের সুষম বিন্যাস' হতো, তাহলে তো তা যতক্ষণ পর্যন্ত সুশৃঙ্খল থাকে ততক্ষণ পর্যন্তই টিকে থাকত। আর এমনটা হলে একজন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে মৌলসমূহ সন্নিবেশিত করে জীবন সৃষ্টি করা সম্ভব হতো। আমরা আশেপাশে তাকালে লক্ষ্য করি, মানুষ কেবল দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অঙ্গহানি থেকেই মারা যায় তা নয়, যে কোনো বয়সে এবং যে কোনো অবস্থাতেই মানুষ অহরহই মারা যাচ্ছে।

কখনও কখনও একজন সম্পূর্ণ সুস্থ-সবল মানুষও হঠাৎ

হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যেতে পারে। কোনো চিকিৎসকই এই মৃত্যুর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। আমরা একটা মৃতদেহকে 'মৌলের সুবিন্যস্ত সমারোহ' হিসেবে মনে করতে পারি। কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পরে দেহের মৌলগত পরিমাণ ও বিন্যাস একই থাকলেও তার ভেতরে থাকা 'আত্মা' বা 'প্রাণ' তো আর নেই। এ থেকে বলা যায়, মৌলের বিন্যাস জীবনকে সৃষ্টি করে না; বরং জীবন হল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বিষয়, ভিন্ন এক সত্তা।

দৈহিক আকার-আকৃতি গঠন করা গেলেও একটা জীবন্ত মানুষকে পরীক্ষাগারে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আমরা জানি, জীবিত মানুষের শরীরের কণাগুলো অনেক পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। মানবদেহে যে কার্বন থাকে কাঠকয়লাতেও থাকে সেই একই কার্বন। যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন মিলে জল তৈরি হয়, তার সঙ্গে মানবদেহের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের কোনো পার্থক্য নেই। দেহস্থ নাইট্রোজেন আর বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনও একই। বাকি পদার্থর ক্ষেত্রেও অনুরূপ কথা প্রযোজ্য। তাহলে কি একথা বলা যায় যে, একজন জীবন্ত মানুষ সাধারণ পরমাণুর বিশেষ সমাহার যা যা আবার বিশেষভাবে বিন্যস্ত? না কি তা অন্য কিছু?

বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে নিয়েছেন, যদিও মানবদেহ কিছু বস্তুগত কণার সমন্বয়ে গঠিত, আমরা সেসব কণাসমূহকে একত্র করে তা থেকে একটি জীবন সৃষ্টি করতে সক্ষম নই। এ থেকে প্রমাণিত হয়, একজন জীবন্ত মানুষের দেহ কেবল অসংখ্য উৎস থেকে আসা নির্জীব পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত নয়। বরং মানবদেহ ‘প্রাণ’ এবং ‘পরমাণু’ এই দুইয়ের এক সম্মিলিত রূপ। মৃত্যুর পরে আমরা দেহের সেই অংশটুকুই দেখতে পাই যা শুধুই পরমাণু দিয়ে গঠিত, আর ‘প্রাণ’ চলে যায় অন্য এক জগতে।

‘জীবন’ এমন কোনো বিষয় নয় যা নির্মূল করা যায়। জীবন যে অনন্তকাল ধরে বিদ্যমান থাকে তা মেনে নিলে ‘মৃত্যু-পরবর্তী-জীবন’-এর অস্তিত্বের ব্যাপারটা আমাদের কাছে একটা যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক বলে মনে হবে। অর্থাৎ, জীবন কেবল মৃত্যুর আগের সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, নিঃসন্দেহে এর পরেও আমাদের আরেকটা জীবন আছে। ইহজগত যে একটা ক্ষণস্থায়ী জায়গা তা আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি থেকেই বোঝা যায়। আসলে আমরা মরে গেলেও হারিয়ে যাই না; বরং আমরা অন্য এক জগতে বাস করার নিমিত্তে এই পৃথিবী থেকে অবসর গ্রহণ করি।

এই ব্যাপারটা বুঝতে পারে বলেই পৃথিবীতে বেশিরভাগ মানুষ ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের কার্যকলাপ তাদের এই বিশ্বাসকে সমর্থন করে না। বেশিরভাগ মানুষই 'জাগতিক সফলতা' পাওয়া নিয়েই আগ্রহী। বিষয়টা সহজ করে বোঝাতে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক: ধরুন, পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আর কাজ করছে না, এবং আমাদের এই গ্রহটা সূর্যের অভিমুখে ঘণ্টায় ছয় হাজার মাইল বেগে ছুটে চলেছে। ভাবতে পারেন এমনটা হলে কী হবে? মানুষ সহজেই বুঝতে পারবে যে, কয়েক সপ্তাহের ভেতর পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। আর এই বোধ থেকেই সর্বত্র হুলুস্থূল বেধে যাবে এবং সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

কিন্তু মানুষ মোটেই উপলব্ধি করতে পারছে না যে, এর চেয়েও বড় বিপদের দিকে পৃথিবী এগিয়ে চলেছে। কী সেই বিপদ? এ বিপদ হচ্ছে শেষ বিচারের দিনের, যেদিন সব মানুষকেই এই পৃথিবীতে তাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে বলা হবে। সে দিনটি তো ঠিক হয়ে আছে এই পৃথিবী সৃষ্টির আগে থেকেই। আর সে দিনটির দিকে আমরা সবাই দ্রুত বেগে ছুটে চলেছি। স্রষ্টার

প্রতি ইমানের অংশ হিসেবে আমাদের বেশিরভাগই এই বাস্তবতাকে মানি। কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব কম মানুষই পরের জীবনের জন্য প্রস্তুতির বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে ভাবি।

কীভাবে আমাদের বিচার করা হবে?

কীভাবে আমাদের বিচার হবে বুঝতে হলে আগে মানুষের কাজের ধারা বোঝা দরকার যাকে আবার দুটো শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণির কাজগুলোকে মানুষের জন্য কোনো নৈতিকতার (ন্যায়-অন্যায়ের) মানদণ্ডে বাছবিচার করার কোনো সুযোগ নেই। ভালো কিংবা মন্দ যা-ই হোক না কেন, এই কাজগুলোর সবই মানুষের জীবনে দৈবক্রমেই ঘটে, সেগুলোকে নির্দিষ্ট নৈতিক মাপকাঠি দ্বারা বিচার করা যায় না, কারণ তাতে কোনোরকম ‘সকাম’ তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান থাকে না। অন্যদিকে, দ্বিতীয় শ্রেণির কাজগুলোর বিষয়ের ব্যাপ্তি অনেক বড় এবং জটিল। এই জাতীয় কাজ করার আগে ভালো-মন্দ, নীতি-নৈতিকতা, বিচক্ষণতা ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনায় নিতে হয়। এগুলিকে আমরা নৈতিক শ্রেণি হিসেবে জানি।

ওই দুই শ্রেণির পার্থক্য নিরূপণে আমরা একটা

উদাহরণের আশ্রয় নেব। ধরুন, এক গাছের ডালে একখণ্ড পাথর বিপজ্জনকভাবে আটকে আছে। আপনি ওই গাছটির নীচ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। এমন সময় আটকে থাকা পাথরটি পড়ে গিয়ে আপনার মাথায় আঘাত করল এবং আপনি মারাত্মকভাবে আহত হলেন। এ অবস্থায় কি আপনি গাছটির প্রতি রাগ দেখিয়ে একে পাল্টা আঘাত করবেন? অবশ্যই না। আবার ধরুন, কেউ একজন একখণ্ড পাথর কুড়িয়ে নিয়ে আপনাকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে আপনার দিকে ছুঁড়ে মারল। পাথরের আঘাতে আপনি আহত হলেন। এতে কি আপনি ওই ব্যক্তির ওপর ক্রুদ্ধ হবেন না? আপনার মধ্যে কি পাল্টা আঘাতের মাধ্যমে প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা জেগে উঠবে না? আপনি যদি ভাবেন, আপনাকে 'ইচ্ছাকৃতভাবে' আঘাত করার কারণে ওই ব্যক্তির 'শাস্তি' পাওয়া উচিত তবে তা মোটেই অযৌক্তিক হবে না। কারণ, এটা দৈবক্রমে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়। বরং এটা ন্যায় কিংবা অন্যায়ের প্রশ্ন, ভালো কিংবা মন্দ অভিপ্রায়ের প্রশ্ন এবং এক কথায় বলতে গেলে 'নৈতিকতা'র প্রশ্ন।

এই দুটি উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে প্রথম ঘটনাটির থেকে দ্বিতীয় ঘটনাটি কোনো পদক্ষেপ

নেওয়ার জন্য আমাকে বেশি সক্রিয় করবে এবং নৈতিকতার নিরিখে তাৎক্ষণিকভাবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। কিন্তু আমাদের জীবনে বহুবিধ জটিল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যেখানে অন্যায় কাজের ফল দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের নজরে না-ও পড়তে পারে। অনেক ক্ষেত্রে অপরাধী আড়ালেই রয়ে যায়, সামাজিকভাবে কিংবা আইন-আদালতের মাধ্যমে কোনোভাবেই তারা শাস্তি পায় না। আবার বেশ কিছু ক্ষেত্রে অপরাধীরা তাদের চাতুর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যবহার করে শাস্তি থেকে পার পেয়ে যায়। আবার বিচার-ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণেও অনেক সময় অন্যায়কারীর কিছুই হয় না। এসব কারণে অপরাধ বার বার সংঘটিত হয়। কিন্তু শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে অপরাধীর সন্তুষ্ট হওয়ার কারণ নেই এজন্য যে, বিচারের দিনে ওই একই কারণে তাকে তার স্রষ্টার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সমাজের যে অবস্থান থেকেই আসুক না কেন, প্রত্যেক মানুষকেই তার স্রষ্টার সামনে একইভাবে হাজির হতে হবে। সেদিন তার সব কর্মকাণ্ডকে নৈতিকতার মানদণ্ডে যাচাই করা হবে। এর ফল হিসেবে হয় তাকে স্বর্গে (বেহেশতে) পাঠিয়ে পুরস্কৃত করা হবে নয়তো নরকের (দোজখের) আগুনে

নিক্ষিপ্ত করা হবে। আর এ সবকিছুই মানুষকে ‘পরীক্ষা’ করার জন্য স্রষ্টার সৃজন-পরিকল্পনার অংশ। কিন্তু এই বিচারপ্রক্রিয়ার পুরোটা মানুষকে জানানো হয়নি। এই বিষয়টি খানিকটা অস্পষ্ট রাখা স্রষ্টার একটি কৌশল। মানুষের জন্য যতটুকু জানা প্রয়োজন, ততটুকু জানিয়ে দেওয়া হয়েছে; যা দিয়েই ইহজগতে তার পক্ষে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব। পরীক্ষার আগেই মূল প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে তো পরীক্ষাটিই অর্থহীন হয়ে পড়ে!

মানুষের প্রতিটি কাজেরই একটা পরিণতি থাকে এবং প্রতিটি অবস্থায় সে নিজেকে খুঁজে পাবে একজন ‘ইতিবাচক’ বা ‘নেতিবাচক’ প্রতিক্রিয়ার অংশগ্রহণকারী হিসেবে। সে নিজেকে ভাঙবে না নির্মাণ করবে, সেটা নির্ভর করবে একেবারেই তার ওপর যে সে বিভিন্ন অবস্থায় কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে। যদি তার প্রতিক্রিয়া ‘ইতিবাচক’ হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আর যদি তার প্রতিক্রিয়া ‘নেতিবাচক’ হয়, তাহলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি বলে বিবেচিত হবে।

পরলোক কী?

পরলোক হল সেই স্থান যেখানে মানুষ তার ‘নৈতিক প্রকৃতি’ দ্বারা করা কাজের উপযুক্ত ফল ভোগ করবে। পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে সেই সন্ধিক্ষণে আমাদের মনে কিছু প্রশ্নের উদয় হতে পারে: মানুষ কীভাবে পরলোকের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করবে? আর তার প্রস্তুতির জন্য সে কী করবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা শব্দ-সংক্রান্ত একটা উদাহরণের আশ্রয় নেব। আমরা জানি, শব্দ এক ধরনের তরঙ্গ যা খালি চোখে দেখা যায় না, মানুষের মুখনিঃসৃত শব্দ বা কণ্ঠস্বর হল জিহ্বা ও স্বরনালির নড়াচড়ার ফলাফল। এই শব্দ বা কণ্ঠস্বর নভোমণ্ডলে এক ধরনের অদৃশ্য ছাঁচ তৈরি করে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসারে, মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত শব্দ, তরঙ্গ আকারে অনাদিকাল থেকে শুরু করে আজও নভোমণ্ডলে বিদ্যমান, যদিও আমরা সে শব্দতরঙ্গ শুনতে কিংবা দেখতে পাই না। তবে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ওই তরঙ্গ থেকে মূল শব্দ আহরণ করে শোনা সম্ভব। অতএব বলা যায়, যেমনভাবে আমাদের সব কথা ও শব্দ নভোমণ্ডলে সুরক্ষিত অবস্থায় আমাদের আবৃত করে রেখেছে, ঠিক

তেমনিভাবে পরলোকও আমাদের কথা, ইচ্ছা, কাজ ইত্যাদি তথ্যপ্রমাণ হিসেবে 'সংরক্ষণ' করে রাখছে যা চাইলে শোনা, পড়া কিংবা দেখা যাবে। বিষয়টা বোঝার জন্য একটা রেকর্ডপ্লেয়ারের কথা কল্পনা করুন। বিদ্যুতের সুইচ অন করার পর প্রথমে ডিস্কটা শব্দহীনভাবে ঘুরতে থাকে। কিন্তু যখনই রেকর্ডপ্লেয়ারের হ্যান্ডেলের পিনটা ডিস্কের উপর বসানো হয়, সঙ্গে সঙ্গেই তা থেকে শব্দ করে সঙ্গীত বেজে ওঠে। মনে হয়, শব্দগুলো যেন শ্রুত হবার জন্যই অপেক্ষায় ছিল। তেমনিভাবে, আমাদের সব কাজই 'সংরক্ষণ' করে রাখা হচ্ছে। বিশ্বনিয়ন্তা যখনই চাইবেন তখনই সবকিছু আমাদের দেখিয়ে ও শুনিয়ে দেওয়া হবে। আর সব দেখা ও শোনার পর লোকেরা বলবে, "হায়! হায়! এ কেমন কর্মলিপি। এ যে ছোট বড় কোনো কিছুই বাদ দেয়নি— সবই এতে রয়েছে?" (কুরআন, ১৮ : ৪৯)

দায়িত্বশীলতা সম্পর্কিত ধারণা

মানুষের জন্য ঈশ্বর অপরিহার্য। ঈশ্বর ছাড়া মানব জীবন অসম্পূর্ণ। এক দার্শনিক যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'যদি কোনো ঈশ্বর না থাকত, তাহলে আমাদের

একজন ঈশ্বরকে আবিষ্কার (খুঁজে বের) করতে হতো।' সৌভাগ্যবশত, ঈশ্বর বাস্তবেই রয়েছেন। কোনো অনুমানের ওপর নির্ভর করে নয়, একদম নির্জলা সত্য হিসেবেই আমরা প্রত্যয়ের সঙ্গে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারি। মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য অব্যর্থ একটি সূত্রের প্রয়োজন। ঈশ্বর সেই সূত্রটি বলে দিয়েছেন যা জীবন পরিচালনার একটি মূল নীতি।

মানুষ কোনো যন্ত্রের মতো নয়, কিংবা সে কোনো যান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা চালিতও হয় না। আবার সে সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রাণীদের মতোও নয়। মানুষ তাকে দেওয়া স্বাধীনতা উপভোগ করে। সে তার 'স্বাধীন ইচ্ছায়' তার কর্ম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, কীভাবে মানুষকে সঠিক পথে রাখা যাবে, আর কীভাবেই বা তার আচরণ সার্বক্ষণিক শৃঙ্খলার মধ্যে রাখা যাবে? সামাজিক চাপ, আইনের প্রয়োগ কিংবা সমাজসংস্কারকদের অনুরোধ? ইতিহাস বলে, এসবের কোনো কার্যকরী ভূমিকা নেই।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, সামাজিক চাপ অতটা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে না। আবার আইনে এত ফাঁকফোকর আছে যে অপরাধীরা ঠিকই পার পেয়ে যায়।

অন্যদিকে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা নিছক উপদেষ্টার মতো। তাদের উপদেশ সাধারণত মানুষের জীবনে তেমন পরিবর্তন আনতে পারে না।

আসল সত্য হল, মানুষের জীবনধারণে সুশৃঙ্খল আচরণ আনার জন্য এমন এক শক্তিশালী সত্তার অস্তিত্বকে মেনে নেওয়াটা জরুরি যে তার চেয়েও আরও অনেক বেশি উন্নততর, যে প্রতিটি ক্ষণে তার প্রতিটি কাজ সম্পর্কে অবগত, যে তাকে যেমন পুরস্কৃতও করতে পারে তেমনি আবার শাস্তিও দিতে সক্ষম, এবং যার কাছ থেকে পালানোর কোনো উপায় নেই।

আর এমন সত্তা তো একজনই আছেন; তিনিই হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস মানুষের জন্য দু'ভাবে কাজ করে। একদিকে সে ঈশ্বরের মাঝে তার একজন প্রতিপালক বা রক্ষককে খুঁজে পায় যিনি তাকে শাস্তি দেওয়ার অসীম ক্ষমতা রাখেন। ঈশ্বরের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো সাধ্য মানুষের নেই। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন মানুষকে জীবনের ব্যাপারে সঠিক মানসিকতা গঠন করতে সাহায্য করে। আর এই সঠিক মানসিকতাই মানুষকে ঈশ্বরের অভিসম্পাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

অন্যদিকে, ঈশ্বরের প্রতি অবিচল বিশ্বাস মানুষের জন্য আশা-আকাঙ্ক্ষার আধার হিসেবে কাজ করে। সত্যের পথে চলার কারণে যদি মানুষের কোনো ক্ষতি হয়, অথবা যদি তাকে অন্য কোনো প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, তাহলে তা সহ্য করতে পারবে এই প্রত্যয় নিয়েই সে এই পৃথিবীতে তার জীবন যাপন করতে পারে। সে যদি সত্যের পথে থাকে তাহলে ঈশ্বর তাকে দান করবেন স্বর্গ বা বেহেশতের অনন্ত জীবন যার থেকে বড় পুরস্কার আর কিছুই হতে পারে না। মানুষের পক্ষে কেবল নিজে থেকেই নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। এটা তখনই সম্ভব যখন মানুষ জানবে যে, এক সর্বশক্তিমান সত্তা তার ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখছেন, যিনি যেমনভাবে তাকে সত্য পথে চালিত করবেন তেমনিভাবে পথভ্রষ্টতার জন্য তাকে শাস্তিও দেবেন। এই জগতে একজন অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের ব্যাপারটা নিশ্চিত করা খুবই দুরূহ একটি কাজ। একইভাবে এখানে কারো ভালো কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থাতেও দুর্বলতা ও অপ্রতুলতা রয়েছে। কিন্তু পরের জগতে তো এই জগতের মতো সীমাবদ্ধতা নেই। সেখানে পুরস্কার ও শাস্তি দুটোই ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে দেওয়া সম্ভব।

একজন শক্তিশালী ও চিরঞ্জীব ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বশীলতার বিষয়ও চলে আসে। আর দায়িত্বশীলতা মানুষকে সঠিকভাবে চিন্তা ও কাজ করার নিশ্চয়তা দেয়, এবং একই সঙ্গে তাকে ঈশ্বরের শাস্তির কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। তা ছাড়া দায়িত্বশীলতার কারণে মানুষের মনে এই বিশ্বাস জন্মায়, যে-কোনো পরিস্থিতিতে ঈশ্বর-নির্দেশিত সঠিক পথে থাকলে পুরস্কার তার কাছে অবশ্যই ধরা দেবে।

আসলে ঈশ্বরের ধারণা মানুষকে এমন একটা মতাদর্শের দিকে নিয়ে যায় যেখানে তার কাছে ক্ষতি লাভে পরিণত হয়, আর মন্দ ভালোতে পর্যবসিত হয়।

হে মানব, বাস্তবতাকে অনুভব করো

শুধু একবার কিছু সময়ের জন্য ভাবুন, আমরা একটি দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন জীবনের পথে যাত্রা করেছি। মৃত্যু এই জীবনের শেষ নয়; বরং এটা নতুন কালের সূচনা এবং আমাদের জীবনের দুটো অধ্যায়ের মাঝখানে একটা বিভাজনরেখা। কৃষকের ফসল বোনার উদাহরণের সাহায্য নিয়ে আমরা বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করব। কৃষক তার

জমি চাষ করে ফসল পেকে শুকিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত নিজের পুঁজি বিনিয়োগ করতে থাকে। তারপর এক সময়ে সে ফসল ঘরে তুলে আনে এবং সারা বছরের জন্য তা মজুত করে রাখে। চাষ করা থেকে ঘরে ফসল তুলে আনা পর্যন্ত একটা পর্যায়। এই পর্যায়ে আসতে গিয়ে সে কেবল অর্থ ব্যয় এবং পরিশ্রম করে। আর পরবর্তী পর্যায়ে বা সময়ে সে তার অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগের ফল ভোগ করে।

আমাদের জীবনটাও একই রকম। এই জগতে আমরা আসলে আমাদের পরবর্তী জীবনের জন্য ফসল বুনি। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা করে কৃষিজমি আছে, যা আমরা হয় চাষ করছি নয়তো নিষ্ফলা অবস্থায় ফেলে রাখছি। আমাদের ব্যবহৃত বীজ হয় কার্যকরী নয়তো মাঝারি মানের। বীজ বোনার পরে হয় আমরা শস্যক্ষেত্রের যত্ন নিই নয়তো অযত্নে ফেলে রাখি। আমাদের বাগানটা হয় আমরা শাখাকণ্টক করে রাখি নয়তো ফুলে-ফলে ভরে ওঠে। হয় আমরা শস্য উৎপাদন বাড়ানোর পেছনে শ্রম দিই নয়তো অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় নষ্ট করি। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ফসলের এই যত্ন নেওয়া চলতে থাকে। মৃত্যুর দিনটিই হল আমাদের ফসল

ঘরে তোলার দিন। এই জগতে চোখ বন্ধ করার পর যখন পরবর্তী জগতে তা খুলব, তখন আমাদের সামনে সেই ফসল হাজির হবে, যে ফসল ফলাতে আমরা ইহলৌকিক জীবনে ব্যস্ত ছিলাম।

আমরা জানি, যে কৃষক চাষাবাদ করে, সে-ই কেবল তার ফসলকে ঘরে তুলতে পারবে। অর্থাৎ কৃষক শুধু তার নিজের বোনা বীজ থেকে উৎপন্ন ফসলকেই ঘরে তুলতে পারে। পরবর্তীতেও সে কেবল তার নিজের তোলা ফসলই ভোগ করতে পারে, অন্য কারোটা নয়। একইভাবে, প্রতিটি মানুষকেই তার এই পৃথিবীতে কৃতকর্মের ওপর ভিত্তি করে প্রতিদান দেওয়া হবে। মৃত্যু হচ্ছে আমাদের প্রথম জীবনের সকল চেষ্টা ও শ্রমের যবনিকাপাতের ঘোষণা। আর অনন্ত পারলৌকিক জীবন হচ্ছে সে চূড়ান্ত স্থান যেখানে আমরা ওই চেষ্টা ও শ্রমের ফসল ভোগ করব। মৃত্যুর পরে চেষ্টার আর কোনো সুযোগ থাকবে না।

সমস্যা হল, মৃত্যুর আগে মানুষ এই বিষয়টা নিয়ে মোটেই ভাবতে চায় না। মৃত্যুর পরে সত্যকে জেনে লাভ নেই, তখন তো সময়ের মেয়াদ শেষ! তখন বোধোদয় হলে তা তো কোনো কাজে আসবে না। তখন তো ভুল শুধরানো,

অনুশোচনা কিংবা প্রায়শ্চিত্ত করার কোনো সুযোগ নেই।

মানুষ সহজেই তার নির্ধারিত গন্তব্যটি (পারলৌকিক জীবন) ভুলে যায় যদিও সময় তাকে সতত সেদিকেই ধাবিত করছে। সে কেবল বৈষয়িক প্রাপ্তির পেছনে ছুটে চলেছে। সে হয়তো ফলপ্রসূ কিছু করছে মনে করে আত্মতৃপ্তিতে ভুগছে। কিন্তু আসলে সে তো তার মূল্যবান সময়ই নষ্ট করছে মাত্র! পরের জীবনের জন্য যা কাজে লাগবে তা করা বাদ দিয়ে সে ছোটোখাটো অপ্রয়োজনীয় কাজে মশগুল। তার প্রতিপালক তাকে অসীম সম্মান ও সুখের স্থান বেহেশতের পথে ডাকছেন, আর সে মগ্ন রয়েছে ক্ষণস্থায়ী আনন্দ আর ভ্রান্তিতে। সে সঞ্চয় করছে মনে করলেও, আসলে সে অপব্যয় করছে। এই পৃথিবীতে সুরম্য প্রাসাদ সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সে হয়তো বড় কোনো অর্জন করে ফেলছে বলে ভাবছে; আসলে সে এমন এক দেওয়াল গড়ছে যা মুহূর্তেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে।

হে মানব! তুমি কী করছ তা অনুভব করো এবং যা তোমার কর্তব্য সেটা করো।

ঈশ্বরকেন্দ্রিক জীবন

পৃথিবী সূর্যের একটি উপগ্রহ। এটি প্রতিনিয়ত সূর্যকে

প্রদক্ষিণ করে চলেছে। সূর্যের চারদিকে একবার আবর্তিত হয়ে আসতে তার একবছর সময় লাগে। ভূপৃষ্ঠে জীবনের ধারা টিকিয়ে রাখার জন্য এই আবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবী যদি সূর্যকে প্রদক্ষিণ না করত, পৃথিবীর বুকে প্রাণের অস্তিত্ব থাকত না।

পৃথিবীর বুকে কীভাবে জীবন নির্বাহ করতে হবে তা আমরা এই বাস্তব উদাহরণ থেকে দেখতে পাই। আমাদের জীবনও ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত করতে হবে যেমন করে প্রকৃতির নিয়মে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। মানুষের সব কাজই হতে হবে ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে।

পৃথিবী ঘুরতে বাধ্য হয় প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী। মানুষকে তার স্বাধীন ইচ্ছার অংশ হিসেবেই ঈশ্বরের কাছে বশ্যতা স্বীকার করা উচিত। ঈশ্বরের ধারণার ওপর ভিত্তি করেই সে জীবন ধারণ করবে এমনটাই কাঙ্ক্ষিত। এই সচেতনতাই মানুষের সকল সফলতা নিশ্চিত করবে, এবং সেইসাথে তাকে করবে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া বা আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকেন্দ্রিক জীবনের শুরু। যখন কোনো পুরুষ ও নারী ঈশ্বরকে

খুজে পায়, তখন ধরে নেওয়া যায় যে সে সত্যের সন্ধান পেয়েছে, যে সত্য তাকে সর্বদা বেষ্টিত করে রাখে। আর এই সত্য আবিষ্কার করাটাও রোমাঞ্চকর একটা অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা তার মনে এক শাশ্বত প্রত্যয়ের জন্ম দেয় যা তার জীবন থেকে সব হতাশা দূর করে। তাই জাগতিক বড় কোনো কিছু হারানোর পরও সে ভাবে যে, ঈশ্বর তখনও তার সঙ্গে আছেন।

ঈশ্বরের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করার মধ্য দিয়েই মানুষ এই বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করতে পারে। আমাদের এই বর্তমান মহাবিশ্ব সততই ঈশ্বরের গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় বহন করে চলেছে। যেমন করে একজন মানুষ আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পায়, ঠিক তেমন করেই ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্বদা দৃশ্যমান।

এই বিস্তৃত মহাজগত মানুষকে বুঝিয়ে দেয় যে এর স্রষ্টা কোনো পরিসীমায় আবদ্ধ নন। সূর্য এবং তারকারাজির সমারোহ বলে দেয়, ঈশ্বর সর্বতোভাবে জ্যোতির্ময়। পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা ঈশ্বরের বিশালত্ব প্রকাশ করে। সাগরের ঢেউ আর নদীর স্রোত বলে দেয়, ঈশ্বর সীমাহীন কল্যাণের ভাণ্ডার। সবুজ বৃক্ষরাজির মধ্যে নিহিত রয়েছে

ঈশ্বরের অনুগ্রহ। মৃদুমন্দ বাতাসের শিহরণের মধ্যে মানুষ স্বর্গীয় পরশ খুঁজে পায়। পাখির কলকাকলিতে মানুষ শুনতে পায় ঈশ্বরের সুর। সর্বোপরি বলা যায়, মানুষের অস্তিত্বই ঈশ্বরের অস্তিত্বের বড় প্রমাণ।

একজন ব্যক্তির জন্য ঈশ্বরকে স্মরণ করার মধ্য দিয়েই শুরু হয় তার ঈশ্বর-কেন্দ্রিক জীবন। তারপর সে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতে শুরু করে। তার আশেপাশের সবকিছুই তাকে ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার হৃদয় ও মন সর্বদাই ঈশ্বরের স্মরণে নিয়োজিত থাকে। তার সকাল-সন্ধ্যা এমনভাবে কাটে যেন সে ঈশ্বরের কাছাকাছিই বসবাস করছে। আর সে সর্বদা মগ্ন থাকে ঈশ্বরের স্মরণে।

মানুষের জন্য ঈশ্বরই হল তার আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রবিন্দু। যার অন্তর ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত, সে প্রতি মুহূর্তেই আধ্যাত্মিকতা অনুভব করে। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস তার জন্য হয়ে ওঠে আধ্যাত্মিক উত্তরণের উৎস। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসায় হৃদয়-মন পূর্ণ থাকায় তার আর কোনো কিছুরই প্রয়োজন হয় না। ঈশ্বর তার জন্য পরিণত হন এক বিস্তৃত মহাসাগরে, যার মধ্যে সে বাধাহীনভাবে সাঁতার কাটতে পারে। এই আধ্যাত্মিক জাগরণের মাধ্যমে

সে এতটাই ঐশ্বর্যের অধিকারী হয় যে, সে তখন আর অন্য কিছুর প্রয়োজন অনুভব করে না।

যে ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছে তার কাছে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই একটি খোলা বইয়ের মতো। ওই বই থেকে সে অনায়াসে ঈশ্বরের কথা পড়তে পারে। গাছের প্রতিটি পাতাই তার কাছে হয়ে ওঠে এক একটি স্বর্গীয় বই।

সে যখন সূর্যকে দেখে, তখন তার মনে হয় ঈশ্বরই যেন তাঁর স্বর্গীয় আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন যাতে সে তাঁর বই ভালোভাবে পড়তে পারে। আর এই পুরো বিশ্বলোক তখন তার কাছে এক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিভাত হয়, যেখানে সে একজন শিক্ষার্থী মাত্র।

ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া তো মানুষের জন্য তার ভালোবাসার কেন্দ্রটিকে খুঁজে পাওয়ার সমার্থক। জন্ম থেকেই মানুষ খুঁজে চলেছে এক পরম সত্তাকে যিনি সর্বতোভাবে তার থেকে অনেক ঊর্ধ্বে, যিনি যাবতীয় সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত, যিনি রয়েছেন তার (ব্যক্তির) অনুভূতির কেন্দ্রে, এবং যাকে পেয়ে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তেমন করেই পরিতৃপ্ত থাকে যেমন করে একটা শিশু তার মায়ের কোলে পরিতৃপ্ত থাকে। ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ

ভুল করে নকল ঈশ্বরকে আবিষ্কার করার হাত থেকে রক্ষা পায়। ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়ে তার ঈশ্বর খোঁজার জন্য প্রকৃতিজাত আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। ঈশ্বরকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হওয়া মানে মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনের বিষয়টা অপূর্ণ থাকা।

কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলে, সহজাত প্রবৃত্তিতেই সে ঈশ্বরের স্থানে অন্য কিছুকে উপাস্য বলে মেনে নিতে পারে। এই উপাস্যটি হতে পারে কখনও একজন মানুষ, কখনও একটি প্রাণী, কখনও প্রকৃতির একটি ঘটনা, কখনও একটি নির্দিষ্ট বস্তুগত শক্তি, কখনও একটি অনুমিত ধারণা, এবং কখনো কখনো ব্যক্তি নিজেই।

যদি কেউ ঈশ্বরকে খুঁজে না পায় অথবা অস্বীকার করে, তবুও ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার তাড়নাকে সে দমিয়ে রাখতে পারে না। সেজন্যই যেসব নারী-পুরুষ ঈশ্বরকে খুঁজে পায়নি, তারা অবধারিতভাবেই অন্য কিছুকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে। মানুষের জন্য তার প্রকৃত ঈশ্বরকে ঈশ্বর হিসেবে না মানা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্যের মর্যাদা দেওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ঈশ্বরকে উপাস্য করার মধ্য দিয়ে

মানুষ যেমন তার মর্যাদাকে উন্নীত করে, তেমনিভাবে অন্য কিছুকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করলে তার মর্যাদার অবনমন ঘটে।

ঈশ্বরের কাছে পূর্ণ সমর্পণই মানুষ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উভয়ের জন্য প্রকৃষ্ট পথ।

If you have enjoyed this book and would like to read more books or watch spiritual videos by Maulana Wahiduddin Khan, please visit us at:

www.cpsglobal.org
www.goodwordbooks.com
www.spiritofislam.co.in

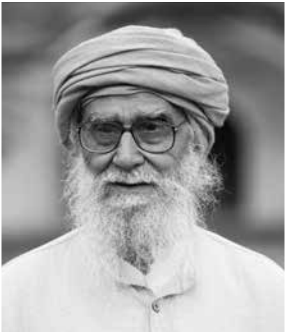

মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান (১৯২৫-২০২১) ছিলেন একজন ইসলামিক পণ্ডিত, আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক এবং শান্তির দূত, তাঁর কাজের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়ে, মওলানা ২০০ টিরও বেশি বই লিখেছেন এবং ইসলামী ধারণার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রজ্ঞা এবং সমসাময়িক শৈলীতে কুরআন ও ইসলামের আধ্যাত্মিক অর্থের উপর হাজার হাজার বক্তৃতা রেকর্ড করেছেন। তাঁর কুরআনের ইংরেজি অনুবাদটি সহজ, স্পষ্ট এবং সমসাময়িক শৈলীতে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। তিনি শান্তির সংস্কৃতির প্রতি মানুষের মনকে পুনঃপ্রকৌশলী করতে এবং শান্তি, অহিংসা এবং আধ্যাত্মিকতার উপর ভিত্তি করে ইসলামকে আধুনিক বাগধারায় উপস্থাপন করতে ২০০১ সালে সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালটি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠা করেন।

mwkhan.com cpsglobal.org

Quran Translations

- English
- French
- Spanish
- German
- Dutch
- Italian
- Russian
- Portuguese
- Polish
- Japanese
- Korean
- Thai
- Chinese
- Ukranian
- Chichewa
- Filipino
- Hebrew
- Sinhalese
- Burmese
- Swahili
- Rwandese
- Czech
- Romanian
- Bengali
- Urdu
- Hindi
- Malayalam
- Tamil
- Marathi
- Telugu
- Gujarati
- Punjabi
- Kannada
- Dogri
- Assamese
- Manipuri

To order a printed copy of the Quran, please log on to:
www.goodwordbooks.com, www.cpsglobal.org

To order Quran copies for hotels, hospitals and prisons please contact: info@goodwordbooks.com, info@cpsglobal.org
Mob: +91 8588822672

For requirements in the US and Canada, please contact:
kkaleemuddin@gmail.com Mob. +1 617-960-7156

মানুষ অসীম সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু এই পৃথিবীতে সেগুলি সে যৎকিঞ্চিৎ ব্যবহার করার সুযোগ পায়। স্বভাবগতভাবে মানুষ অনন্তকাল বেঁচে থাকতে চায়, কিন্তু খুব শীঘ্রই তার অজান্তে মৃত্যু এসে হানা দেয় এবং তার জীবনের যবনিকা পতন ঘটে। তার মনে থাকে বাসনার অসীম পারাবার, কিন্তু সেই বাসনা কখনও পরিতৃপ্ত হয় না। তার জীবন থাকে স্বপ্নাবিষ্ট, কিন্তু সেই স্বপ্ন কখনও বাস্তবায়িত হয় না। ধনী ও দরিদ্র সকল মানুষের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই। মানুষ আর এই পৃথিবী এতো বেমানান কেন?

goodwordbooks.com cpsglobal.org

Goodword Books

CPS International
centre for peace & spirituality

PDF